সাদার দেশে কালো মানুষ

কুন্তলা লাহিড়ি

'নিগ্রাঙ্গ-তায়ারের বিয়ে'

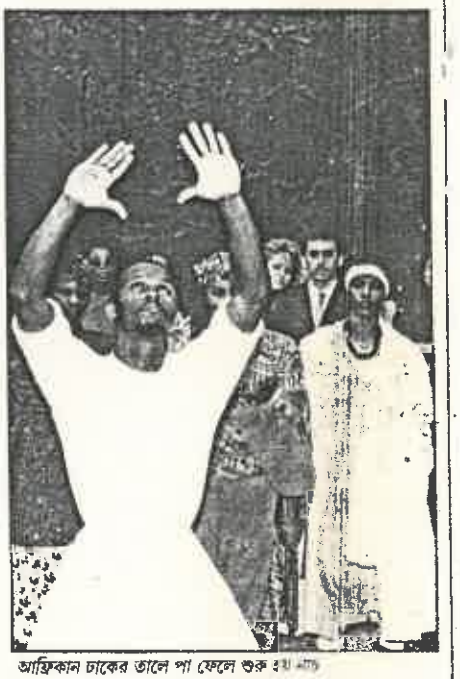

আফ্রিকান ঢাকের তালে পা ফেলে শুরু হয় নাচ

এক আদিম যূথবদ্ধতার আভাস পাওয়া যায় কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের জীবনে

কোন দিকে যাচ্ছে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গরা ?

ভবঘুরে, ছন্নছাড়া কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে খাবার বিতরণ হচ্ছে বিনে পয়সায়

শুরু এইভাবে

'হাউ ক্যান টু এনটায়ারলি ডিফারেন্ট পীপল লিভ পীসফুলি ইন দ্য সেম কানট্রি ?' উত্তেজিতভাবে কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে দম নেবার জন্যে থামলো জেফ। 'এ রেস অফ পীপল হু ওয়্যার ওয়ানস্ ওনড্ বাই দ্য আদার ক্যান নেভার ফরগিভ দেম।'

জেফ ডোনাল্ডসন। লম্বা ছিপছিপে আকর্ষণীয় চেহারার এই তরুণটি সর্বদাই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, স্বভাবটি হাসিখুশি ও খোলামেলা। তাকে এত উত্তেজিতভাবে কথা বলতে কখনও শুনিনি। আলোচনা শুরু হয়েছিল হাওয়ার্ড ক্যাফেটেরিয়ায় দ্বিপ্রাহরিক আহার-টেবিলে জমজমাট আড্ডার আসরে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার অধ্যাপক জেফ। হই হই করে অধ্যাপকদের জন্যে নির্দিষ্ট ক্যাফেটেরিয়া প্রায়ই মাতিয়ে তোলে সে।

জেফ কৃষ্ণকায়। অর্থাৎ আমরা যাদেরকে 'নিগ্রো' বলে জানি এদেশে, আজকাল ইংরেজিতে পরিশীলিতভাবে যাদের বলে 'ব্ল্যাক'। মাঝখানে 'কালারড' শব্দটাও বেশ চালু হয়েছিল, তবে তাতে সংজ্ঞাটার পরিধি বেড়ে যাওয়ায় এখন তা

মধ্যবিত্ত, প্রফেশনাল কৃষ্ণাঙ্গ নারী

মোটামুটি
না, কারণ
দেওয়া।
'অ্যাফ্রো-অ
মার্কিন
সি-র প্রা
ইউনিভার্সি
উচ্ছেদের
কৃষ্ণাঙ্গপ্রে
উচ্চশিক্ষা
অনেকটাই
ওদেশে
কলেজ-বি
হাওয়ার্ড
করে রয়ে
ও গর্বের
আইন অ
অপরচুনি
এরও দ
জন্যে। এ
প্রথম থে
শ্বেতাঙ্গের
কৃষ্ণাঙ্গ—
আর খা

জমাইকা থে

এরকম পোশাকেই হয়তো এসেছিল নতুন দুনিয়ার উপনিবেশস্থাপনকারীরা

জামাইকা থেকে আসা এক রাস্টাফেরীয়

মোটামুটি পারত্যক্ত। জেফ নিগ্রো বলে না, কারণ নামটা সাদা চামড়ার লোকেদের দেওয়া। অনেককে আবার শুনেছি নিজেদের 'অ্যাফ্রো-আমেরিকান' বলতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি·সি-র প্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত এই হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি। ১৮৬৭ সালে, অর্থাৎ দাসপ্রথা উচ্ছেদের দু' বছর পরে, এটিকে গড়ে তোলেন কৃষ্ণাঙ্গপ্রেমী এক শিক্ষাবিদ, কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। সেই প্রচেষ্টার অনেকটাই আজ সফল হয়েছে বলতে হবে। ওদেশে এখন আর এই ধরনের 'মাইনরিটি' কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু হাওয়ার্ড তাদের মধ্যে এক উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে রয়েছে। মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের অত্যন্ত আদরের ও গর্বের বিষয় এই বিশ্ববিদ্যালয়। ওদেশের আইন অনুসারে এখন হাওয়ার্ড-ও 'ইকোয়াল অপরচুনিটি'র নীতি মেনে চলতে বাধ্য। তাই এরও দরজা খুলেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাদাদের জন্যে। এসব নিয়েই সেদিনের কথার সূত্রপাত। প্রথম থেকেই মনে প্রশ্ন জাগতো, ক্যাম্পাসে শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা এত কম কেন? প্রচুর কৃষ্ণাঙ্গ—মার্কিনী বা অন্যান্য দেশের, কিছু হলদে আর খয়েরি চামড়ার ছাত্রছাত্রীও রয়েছে, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের মধ্যে তো ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সংখ্যা রীতিমত চোখে পড়ার মত। বিদেশাগত কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে রয়েছে ক্যারিবীয়ান দ্বীপগুলো, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার নানা দেশ থেকে আসা ছেলেমেয়েরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সত্যিকারের ইউনিভার্সাল চেহারাটি হয়তো সর্বাঙ্গসুন্দর হত সাদা-কালো ছাত্রছাত্রীদের পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করতে দেখলে। মনে ধন্দ লাগতো—'সাদা-কালো ভাই-ভাই' ব্যাপারটা শুধুমাত্র ওদেশের রেডিও-টি·ভি -কাগজপত্রে ঢাক পেটানো একটা অবাস্তবতা নয় তো? যে দু-একটি সাদা চামড়ার ছাত্রছাত্রী কোনমতে টিকে রয়েছে হাওয়ার্ডে, তারা যেন সর্বদাই ভীতসন্ত্রস্ত এবং সাদা হওয়ার অপরাধে কুণ্ঠিত।

ছাত্রছাত্রীদের কাফেটেরিয়ায় কখনো কখনো দুপুরবেলা খাবার খেতে এসে চোখে পড়তো স্বাস্থ্যদীপ্ত চকচকে কালো চামড়ার ছেলেমেয়েরা ঝকঝকে দাঁতে হাসছে; অথচ সাদা ছেলেটিকে যেন খুঁজেই পাওয়া দায়—সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে এতই ব্যস্ত। হয়ত রীতিমত লড়াই করে এই পড়াশুনোর অধিকারটুকু আদায় করে নিতে হয়েছে বলে, অথবা ছাত্রছাত্রীদের একটা বিরাট অংশ আসছে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত

কৃষ্ণাঙ্গদের উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র—হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

পরিবারগুলো থেকে, সেজন্যে—লক্ষ্য করতাম হার্ওয়ার্ড এর পরিবেশে ভারি একটা পরিচ্ছন্নতাময় গাম্ভীর্য , বিষণ্ণ ভাব। সে তুলনায় শহরের অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ-প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশে উচ্ছলতা বেশি, হঠাৎ হই-চই করে গান গেয়ে ওঠা বা দুপাক নেচে নেবার প্রবণতা সহজেই চোখে পড়ে। সেখানে করিডোরগুলোয় সিগারেটের ছাই ও চ্যাপ্টানো ফিল্টার, এবং তোবড়ানো সোডা, এমনকি বীয়ারের ক্যান এদিকে-ওদিকে অস্ত্রত্র ছড়িয়ে থাকাটা বিশেষ আশ্চর্য দৃশ্য নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই পরিবেশ কি মানসিকতার পৃথক ফল? এসব প্রসঙ্গ কথায় কথায় এসে পড়েছিল খাবার টেবিলে, জেফের সামনে। তাতেই এই বিস্ফোরণ। ছটফটে, হাসিখুশি এই শিল্পীটির মনে এত বারুদ জমে আছে, তা কে ভেবেছিল?

কে এই মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ?

ওদেশের সরকারি ব্যাখ্যা অনুযায়ী কারো শরীরে চৌষট্টিভাগের এক ভাগ কৃষ্ণাঙ্গ জাতির রক্ত বইলেই সে কৃষ্ণাঙ্গ, তা সে যতই ফর্সা হোক না। সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে আজ পর্যন্ত—এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অসংখ্য বার, অজস্র-রকমের রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটেছে মার্কিন দুনিয়ায়। খাঁটি, অবিমিশ্রিত রক্তের মার্কিনী নিগ্রো সম্ভবত আর একটিও নেই। সেদিক থেকে ভাবতে গেলে ওদেশের সব কৃষ্ণাঙ্গই 'মুলেটো' অর্থাৎ মিশ্রিত জাতি। ঘন কালো থেকে হাল্কা প্রায়-গোলাপি গায়ের রঙ, টিকোলো থেকে চওড়া বোঁচা নাক, পাতলা থেকে ঠেলে বেরোনো মোটা ঠোঁট, এবং ঘন কোঁচকানো থেকে সোজা, ফুরফুরে চুল—এর মধ্যের সবরকমের শেড, আয়তন, আকৃতি ও ঘনত্ব চোখে পড়বে বিভিন্ন কম্বিনেশনে। অর্থাৎ, যে কোনো একটা বিশেষ চেহারা দিয়ে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গকে ভাবা অসম্ভব।

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, হাইতি-বার্বাডোস-জামাইকা-কিউবা প্রভৃতি ক্যারিবীয়ান দ্বীপ, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা, এবং ব্রেজিল ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য উপনিবেশগুলোতেও চলছিল ক্রমাগত রক্ত ও জাতির সংমিশ্রণ। আদি ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয় ও আফ্রিকান—এই তিন জাতির সমন্বয় সেসব দেশে সৃষ্টি হল এক নতুন মানুষের দল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জাতিগত মিশ্রণ ঘটলো, কিন্তু একটু ভিন্নভাবে। অ্যাংলো-স্যাক্সন, বিশেষত প্রোটেস্টান্ট মন ছিল এভাবে জাতিগত মিশ্রণের চরম বিরোধী। তার মানে আদতে এই নয় যে ল্যাটিন আমেরিকার তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাস মায়েদের কোলে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক মুলেটো সন্তানের জন্ম হয়েছে। এর অর্থ হল, যত আগেই হোক না কেন, কোনো ব্যক্তির বংশ তালিকার একটিও কৃষ্ণাঙ্গ পূর্বপুরুষ থাকলে তাকে কৃষ্ণাঙ্গ বলেই গণ্য করা হবে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বপুরুষের গায়ের রঙ হয়ে দাঁড়ালো প্রায় আমাদের ভারতবর্ষের জাত-পাতের বিচারের মাপকাঠির মত।

আরেক অর্থেও মার্কিন দেশের কৃষ্ণাঙ্গরা সৃষ্টি করলো নতুন এক জাতি। আফ্রিকার বিভিন্ন অংশের পৃথক জাতি-ধর্মের মানুষগুলো মার্কিন দেশে ক্রীতদাস হিসেবে এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে গেল। ইণ্ডিয়ান প্রতিবেশী ও তার শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের সঙ্গে ব্যাপক সংমিশ্রণ না হলেও শুধু নানান ধরনের আফ্রিকানরাই আন্তঃমিশ্রণের মাধ্যমে সৃষ্টি করতো এক নতুন কৃষ্ণাঙ্গ জাতি।

এবার কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে বলি। পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকায় ১৬৫০ সাল নাগাদ কৃষ্ণাঙ্গের সংখ্যা ছিল ষোল শো মত। ১৭৭০ সালে তা দাঁড়ায় সাড়ে চার লক্ষের কিছু বেশি এবং ১৭৮০ সালের মধ্যে এর আওতায় আসে আরও এক লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ। অর্থাৎ সংখ্যাগুলো সত্যি হলে বুঝতে হবে ১৬৫০ থেকে ১৭৮০—এই একশো তিরিশ বছরে কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩৫০ গুণ। অপেক্ষাকৃত বেশি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় ১৭১০ সালের প্রথম জনগণনার পর থেকে। সেবছর ওদেশে ছিল প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ। পরবর্তী একশো বছরে এই সংখ্যা প্রায় দশগুণ বেড়ে দাঁড়ায় পঁচাত্তর লক্ষে। বর্তমানে মার্কিন দেশে কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা সরকারি মতে প্রায় দুশো সত্তর লক্ষ। স্বাভাবিকভাবে, শিশু জন্মের মধ্যে দিয়ে, এই বৃদ্ধি যত না ঘটেছে তার চেয়ে বেশি ঘটেছে ক্রীতদাস আমদানির মাধ্যমে।

সংখ্যায় বাড়লে কি হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যায় কৃষ্ণাঙ্গদের শতকরা ভাগ ক্রমশ কমে গেছে। ১৭৯০ সালে ওদেশের মোট জনসংখ্যার ১৯·৩ শতাংশ ছিল কৃষ্ণাঙ্গ, বর্তমানে এই হার কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১১·৮ শতাংশে। এর কারণ হল গৃহযুদ্ধের পর দাস-বাণিজ্যের অবসান। মোট জনসংখ্যায় কৃষ্ণাঙ্গের অনুপাত কমতেই থাকে ১৯৪০ সালের জনগণনা পর্যন্ত। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যুদ্ধোত্তর 'বেবি বুম' জনবৃদ্ধির হারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে; মোট জনসংখ্যায় কৃষ্ণাঙ্গদের সামান্য কিছু বৃদ্ধি ঘটে। সাম্প্রতিককালে ওদেশে অভিবাসনের নিয়ম-কানুনে কড়াকড়ি করে ইউরোপীয়দের প্রবেশ প্রায় বন্ধ করে দেওয়ায় কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা আবার কিছুটা বেড়ে গেছে।

ফিলিস হুইটলে—আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী, যাঁর কবিতা প্রকাশ হয়েছিল

চরৈবেতি

আমার জানা এক কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের কথা বলি। মিসিসিপির এক দাস পরিবারের সন্তান দুই

ব্যাংকস বিয়ে করেন এক আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান মহিলাকে। নানা জায়গা ঘুরে ফিরে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এসে পৌঁছান শিকাগোয়। তাঁর ছেলে রবার্ট ব্যাংকস ডেট্রয়েটের ফোর্ড গাড়ির কারখানায় সামান্য মজুর থেকে ধীরে ধীরে ফোরম্যানের পদে ওঠেন। তাঁর ছেলে চার্লস ব্যাংকস হাওয়ার্ড-এ পড়াশুনো শিখে ডেট্রয়েটে সরকারি চাকরীতে যোগ দেন। বিয়ে করেন অক্সফোর্ডের জোহনেলা ব্যাংকসকে। এঁদের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলেপুলেদের নিয়েই জোহনেলা ধীরে ধীরে পড়াশুনা শেষ করেন।

ষাটের দশকে এঁরা এক বড় সিদ্ধান্ত নেন, ডেট্রয়েট ছেড়ে রাজধানী ওয়াশিংটন ডি· সি·-তে চলে আসার। এর জন্যে জোহনেলাকে চাকরি ছাড়তে হয়। চার্লস ব্যাংকস এখন সরকারি ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উচ্চপদে রয়েছেন। জোহনেলাও হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। ওঁদের ছেলেমেয়েরা হাওয়ার্ড থেকে পড়াশুনো করেছে প্রত্যেকেই। কারু কারু উঁচু হনু, টেরা চোখ ওদের শরীরে আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান রক্তের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এক ছেলে শিকাগোয়, অন্যজন ক্যালিফোর্নিয়ায়, ইলেকট্রনিক্স বিশারদ তৃতীয় জন সবে টেক্সাসে চাকরি পেয়েছে। মেয়েদের একজন সাউথ ক্যারোলাইনাতে, অন্যজন জর্জিয়ার অ্যাটলাণ্টায়। দুজনেই চাকরি করে, স্বাধীন। এরা কেউই বিয়ে করেনি একমাত্র মেজ ছেলে একটি মেয়ের সঙ্গে বছর দু-তিন থাকার পর একটি সন্তানের পিতা হতে চলেছে, এবং এবারে বিয়ে করবার কথা চিন্তা করছে। এই পরিবারটি কিন্তু মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের ছোট একটি অংশের প্রতিনিধি। এরা শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত, প্রফেশনাল কৃষ্ণাঙ্গ। স্থানান্তরী হবার সঙ্গে সঙ্গে এরা সমাজে নিজেদের স্ট্যাটাস ও ভূমিকাও ধীরে ধীরে পাল্টে চলেছে। এই চলনশীলতার শেষ কোথায় ?

কৃষ্ণাঙ্গদের এই যে আবার দক্ষিণে ফিরে যাওয়া—এর বিপুল তাৎপর্য রয়েছে দেশের রাজনৈতিক ও সরকারি নীতি নির্ধারণে। দক্ষিণাঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ছিটে-ফোঁটা কি কৃষ্ণাঙ্গদের জুটবে শেষ পর্যন্ত ? এদের প্রতি দক্ষিণের রক্ষণশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক জাতিবিদ্বেষের ঐতিহ্য অনেকদিনের। কৃষ্ণাঙ্গদের উন্নয়নকল্পে সরকারি খরচ-খরচা বেশি হলে সেখানকার বাসিন্দা এবং নতুন শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ জন্মানো স্বাভাবিক।

এখনও পর্যন্ত দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে সাধারণভাবে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। ১৯৮০ সালের দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলো গড় বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় একুশ হাজার ডলার, অথচ কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারগুলোর ছিল মাত্র বারো হাজার ডলার। যেখানে শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলো দশভাগের মাত্র একভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে, সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারগুলোর এক-তৃতীয়াংশ এখনো রয়েছে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে।

অভিবাসী কৃষ্ণাঙ্গরা

কৃষ্ণাঙ্গরা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাঠিতে এদের ঠাঁই মার্কিন সমাজের তলার দিকে। এরা ছাড়াও রয়েছে আরও এক ধরনের কৃষ্ণাঙ্গ, যারা মার্কিনী নয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে উন্নত জীবনযাত্রার হাতছানিতে ছুটে আসা নানান রকমের নানান বয়েসের স্ত্রী-পুরুষ যেমন এই দলে রয়েছে, তেমনি আছে ক্যারিবীয়ান সাগরের ছোট ছোট দ্বীপগুলো থেকে আসা মানুষের দল ; অথবা মাথায় জটা, গাঁজায় দম দেওয়া, সম্রাট হাইলে সেলাসির উপাসক রাস্টাফেরীয়-রা। এরাই এদেশে চালু করেছে জামাইকার বব মার্লি বা পিটার টশের 'রেগে' সংগীত। সহজ সরল ভাষায় গাওয়া কালো মানুষদের ও স্বাধীনতার এবং বিশ্বশান্তির এসব গান বেশ কিছুদিন ধরেই ওদেশে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

শুধু গান নয়, আরো নানাভাবে এই অভিবাসীরা মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের সাংস্কৃতির ধারাকে প্রভাবিত করছে। ফেলে-আসা, হারিয়ে-যাওয়া, শিকড়ের সন্ধানে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের যে অবিরত যাত্রা তার দিশারী হচ্ছে এই অভিবাসীরা। এমনিতেই দেশটা পৃথিবীর নানান দেশের মানুষে ভরা, যাদের প্রত্যেকেই নিজস্ব সংস্কৃতির চরিত্র কিছুটা বজায় রেখে মার্কিন স্রোতে অংশ নিচ্ছে। তার মধ্যে, সম্ভবত সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু দল হবার সুবাদে, কৃষ্ণাঙ্গদের এই শেকড় খোঁজার, বা আঁকড়ে ধরার ব্যাপারটা বেশ চোখে পড়ে।

মার্কিন সমাজের একেবারে তলার ধাপে থাকা এসব কৃষ্ণাঙ্গ অভিবাসীরা স্বভাবতই সামাজিক প্রতিপত্তিতে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের সমকক্ষ নয়। প্রথম বংশের প্রচারক বলে এদের অর্থনৈতিক অবস্থাও তেমন ভালো নয়। আবার এদের ধ্যান-ধারণা ও মানসিক গঠনও কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের থেকে ঢের আলাদা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই যে ব্যাঙ্কে যেতাম মাইনের চেক ভাঙাতে, সেখানে কাজ করতো দেখা আদেফোলাজু। নাইজেরিয়ার ছেলে, পড়াশুনো করতে এদেশে এসে রয়ে গেছে। সংসারী মানুষ, বাচ্চাদুটিকে অসম্ভব ভালোবাসে এবং সংসারের স্বচ্ছলতা বাড়াতে দিবারাত্র খাটে। ব্যাঙ্কে ছাড়াও সন্ধেবেলায় একটি, এবং শনি-রবিবারে আরেকটি পার্ট-টাইম কাজ করে। ব্যাঙ্কের বিশালায়তন কৃষ্ণাঙ্গ ম্যানেজার প্রথম আলাপেই আচমকা 'ডেট'-এর প্রস্তাব দিয়ে ফেললে হকচকিয়ে যাওয়া আমাকে দুঃখিত স্বরে দেবো বলেছিল : 'কিছু মনে কোরো না কুন্তলা, এই মার্কিনীগুলো এরকমই। ওরা আমাদের দেশের রীতিনীতি বোঝে না, কোনো ভারতীয় মহিলাকে কী ভাবে সম্মান দিয়ে কথাবার্তা বলতে হয় তা ওরা জানে না।' বলাই বাহুল্য, দেবোর মন্তব্যে আরো বেশি হকচকিয়ে গেছিলাম আমি ! তবে হ্যাঁ, বুঝেছিলাম এদেশের সব কৃষ্ণাঙ্গকে একই ছাঁদে ফেলা যাবে না। গায়ের রঙটা শেষ বিচারে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বন্ধন হতে পারে না। শুধু কৃষ্ণাঙ্গ বলেই সম্পূর্ণ মানসিক নৈকট্য কিভাবে জন্মাবে ?

ভেতর-শহরের গায়ে গা-ঘেঁষা রো হাউস

খে পড়ে ।
। ধাপে থাক
ই সামাজিক
বর সমকক্ষ
বলে এদের
নয় । আবার
নও কৃষ্ণাঙ্গ
আলাদা ।
তো দেবো
।, পড়াশুনো
সোরী মানুষ,
ং সংসারের
্যাঙ্কে ছাড়াও
র আরেকটি
বিশালায়তন
ই আচমকা
কিয়ে যাওয়া
: 'কিছু মনে
। এরকমই ।
বোঝে না,
সম্মান দিয়ে
না ।' বলাই
। হকচকিয়ে
াম এদেশের
যাবে না
। গুরুত্বপূর্ণ
ষ্ণাঙ্গ বলেই
জন্মাবে ?

সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা অনেক বছরের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার ফসল । এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অংশীদার নয় কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান ও অধিবাসী । সাউথ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে দুই গোষ্ঠী হাতে হাত মিলিয়ে রাস্তায় নামলেও পার্থক্য যেন কোথায় একটা থেকেই যায় ।

ইনার-সিটি এবং অন্যান্য

তবে হ্যাঁ, দারিদ্র্যের সংস্কৃতি সর্বত্রই এক, যদি [illegible] সর্বপ্রধান সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয় । যেমনটা ঘটেছে দুই প্রতিবেশী মিসি [illegible]সন ও নরমান ফ্ল্যান্দিস-এর ক্ষেত্রে । মিসি দেখাশুনো করে এক অভিজাত ধনী বৃদ্ধাকে, 'ডোমেস্টিক হেল্প' হিসেবে এই জীবিকা তাকে জীবনের ছোটখাটো বিলাসগুলোতেও গা ভাসাতে দেয় না কিছুতেই । আর নরমান, বা ফ্ল্যানো, এসেছে জামাইকা থেকে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য চাকরি নিয়ে । রাস্টাফেরি ধর্মের অন্ধ সমর্থক ফ্ল্যানো অবসর সময়ে নিজের 'রেগে' গানের দল 'ব্ল্যাক ওহুরু' (কৃষ্ণ স্বাধীনতা) নিয়ে মেতে থাকে । দুজনে পাশাপাশি দুটো ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকে এক ঘিঞ্জি গরিব পাড়ায়, এদেশে যাকে বলে 'ঘেটো' । আবার গ্রাম থেকে দলে দলে চলে আসা কৃষ্ণাঙ্গরাও এসে দখল করছে মেট্রোপলিটান শহরগুলোর কেন্দ্রীয় অঞ্চল । এই 'ভেতর-শহর' বা 'ইনার-সিটি' হল সবরকম ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র । তাই এখানে কাজকর্ম খুঁজে পাওয়া সহজ । এসব অঞ্চলগুলোতে ভীড় করে রয়েছে গ্রামত্যাগী কৃষ্ণাঙ্গ অভিবাসীরা । ১৯৮০ সালেও শহরবাসী কৃষ্ণাঙ্গদের প্রায় ২৪ শতাংশ বাস করতো এই ভেতর-শহরে । রাজধানী হবার সুবাদে অন্যান্য মার্কিন শহরের তুলনায় কম হলে কি হবে, ওয়াশিংটনেও রয়েছে এই ধরনের দারিদ্র্যপীড়িত পাড়া—ইকনমিক্যালি ডিপ্রেস্‌ড্ নেবারহুড । প্রদীপের ঠিক তলায় যেমন অন্ধকার, তেমনি কৃষ্ণসংস্কৃতির পীঠস্থান হাওয়ার্ডের চতুর্দিকেই দেখতাম প্রকট দারিদ্র্য । শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রোজগারপাতি বাড়লে কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনীরা ক্রমশ এসব পাড়া ছেড়ে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, সাধারণত শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত, অঞ্চলগুলোতে সরে যাচ্ছে । অর্থনৈতিক মই বেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনীদের এই ওপরে ওঠার ফলে খালি হওয়া জায়গাটুকুতে ঢুকে পড়ছে অভিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ ও ল্যাটিন আমেরিকানরা ।

ছবি : লেখিকা

জেসি জ্যাকসন এবারও মনোনয়ন পেলেন না । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও একজন কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতির জন্যে প্রস্তুত নয়

এই পাড়াগুলোর জীবনযাত্রার ধরন মনোযোগ আকর্ষণ করার মত । রাস্তাঘাটে এত ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে থাকতো যে ভুলেই যেতাম এক সমৃদ্ধ দেশে রয়েছি । চটি পায়ে হাঁটলে অজস্র বোতল ভাঙা কাঁচ ফুটে যাবার নির্ঘাত সম্ভাবনা । রাস্তার পাশে সার সার গায়ে গায়ে লাগানো বাড়ি । এ সব রো-হাউসের সিঁড়িতে বসে অলস বেকার ছেলের দল । ঠিক বেকার নয়, কারণ এদের অনেকেরই জীবিকা মেয়েমানুষ বা ড্রাগসের ব্যবসা । ইনার-সিটির রাস্তায় সর্বক্ষণ টহলদারি চলছে পুলিশের । তাতেও ছোট-বড়-মাঝারি নানারকম অপরাধের অন্ত নেই । গড়ে প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার কানে আসবে অ্যাম্বুলেন্স, দমকল বা পুলিশভ্যানের সুতীব্র সাইরেন ।

এরকমই এক পাড়ায় থাকতো জামাইকার কার্ল হাচিনসন । চাকরি করে অবসর সময়ে পড়াশুনো করছে সে, যাতে ভালো পাড়ায় শিগ্‌গীরি বাসা ভাড়া নিতে পারে । পাশের বারান্দায় সর্বক্ষণ দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকতে দেখতাম ওর প্রতিবেশীকে । দু'দিন তাকে দেখছি না কেন জিজ্ঞাসা করতে উত্তর দিল : 'ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে' (দ্য কপস গট হিম) । আর তার বউটি ? 'বউ তো নয়, মেয়ে বন্ধু—একসঙ্গে থাকতো দুজনে । তা সে তো ইতিমধ্যেই আরেকজনের সঙ্গে চলে গেছে । বাচ্চাটা এখন রয়েছে কোন এক অনাথ আশ্রমে ।'

এরকম ঘটনা হামেশা ঘটছে । একটি কোঁকড়াচুলো ন'-দশ বছরের ছেলে আমি গেলেই ছুটে আসতো— 'হাই কুন্তলা' । ভারি মিষ্টি আর বুদ্ধিমান ছেলেটিকে দেখে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে যেত । সর্বক্ষণ ওর পেয়ে থাকতো দুর্দান্ত খিদে, বাঙালীর ভাত-ডাল গোগ্রাসে গিলে ফেলতে দেরি লাগতো না । আনোয়ারের বাবা জন্ম দিয়েই দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়েছে, মাকেও তেমন কোনো কাজকর্ম করতে দেখিনি । ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় স্কুল ফাঁকি দিয়ে । বড়দের হাতের অকারণ ধোলাই আর সমবয়েসীদের সঙ্গে সর্বক্ষণ আপোসে মারপিট—এভাবেই শিখছে সে জীবনের বর্ণপরিচয় । কে জানে ওই হয়তো বড় হয়ে জো লুই, মহম্মদ আলি বা মাইক টাইসনের মত লড়বে অন্য এক লড়াই—পাদপ্রদীপের আলোয় দর্শকের হাততালির মাঝখানে । কিংবা ড্রাগ বেচবে, গুণ্ডাদলে নাম লেখাবে, যদি বেঁচে থাকে । হয়তো কোনো অন্ধকার জেলখানায় হারিয়ে যাবে, অথবা মার খেয়ে রাস্তায় পড়ে পড়েই মরে যাবে একদিন । ইনার-সিটির কৃষ্ণাঙ্গদের ভারি কঠিন জীবন, বিষম অনিশ্চয়তা ।

হয়তো তার থেকেই জন্ম নিয়েছে স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর প্রতি বিরাগ ও আলসেমি । ওয়াশিংটন ডি· সি-র কোনো কোনো স্কুলে পড়াশুনো না করাটাই চালাকির লক্ষণ । এই মানসিকতা এত প্রবল যে প্রশ্নের উত্তর জানলেও সহপাঠীদের চাপে, যাকে ওরা বলে 'পীয়ার প্রেশার', উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দেওয়া বিশেষ অপরাধ ! ওয়াশিংটন ডি· সি-র চোদ্দটি সরকারি স্কুল থেকে গত বছর মাত্র চারজন জাতীয় বৃত্তি পেয়েছে । অথচ শহরের উপকণ্ঠের অপেক্ষাকৃত

ছবি : ইউ এস আই এস-এর সৌজন্যে

উন্নত অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর প্রতিটি স্কুল থেকে গড়ে বিশ-পঁচিশ জন করে এই বৃত্তি পেয়েছে। শতাব্দীর হাড়ভাঙা পরিশ্রমে যাদের দেহ হয়ে উঠেছে সবচেয়ে সুগঠিত, উন্নত, উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধি ও মনের চর্চা করলে তারা হয়ে ওঠে মানুষজাতির সেরা নিদর্শন, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এরকম কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের অভাব নেই ওদেশে যাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। তবু, কেন এদের একটা অংশ পিছিয়ে পড়ে আছে সমাজের সকলের নীচে ?

কিছু ইতিহাস ও কৃষ্ণাঙ্গ-মন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস ব্যবসার পত্তন ও ছড়িয়ে পড়ার গোড়ার দিকের ইতিহাস তেমন করে কোথাও লেখা হয়নি ; হয়ে থাকলেও তা আজ আর পাওয়া যায় না। ১৬২৪ সালে প্রকাশিত 'জেনারাল হিসটোরি' (Generall Historie) বইয়ের এক জায়গায় ক্যাপ্টেন জন এ সম্পর্কে লিখছেন : 'About the last of August came in a Dutch man of warre that sold us twenty negars'.

উপনিবেশ স্থাপনের আদি ইতিহাসে এর চেয়ে বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন ঐতিহাসিকেরা বোধ করেননি। কোথাও প্রশ্ন ওঠেনি ক্রীতদাসপ্রথা, জাতিগত পক্ষপাত, ও অর্থনীতির মধ্যে ঠিক কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যাণ্ডের প্রধান অর্থকরী ফসল তামাক সম্পর্কে অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু যে কালো মানুষেরা এই ফসল উৎপাদন করছে তাদের বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা কিন্তু নিঃশব্দ। হয়তো অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতেও মার্কিনী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্ববন্ধন তেমন শিকড় গেড়ে উঠতে পারেনি, তাই এই নীরবতা। তা হলেও যে দ্রুতবেগে দাসপ্রথা ওদেশে ছড়িয়ে পড়ল তা ছিল এই ক্রমবর্ধমান শ্রমিক সঞ্চালন পদ্ধতি নিয়ে ভাবানোর মত।

এছাড়া ঔপনিবেশিক আমেরিকার আদি ইতিহাস যাঁরা লিখে গেছেন তাঁরা কেমন মানুষ তাও বিচার করতে হয়। এঁরা ছিলেন সাধারণত যাজক-পুরোহিত গোষ্ঠীর, যাঁদের লেখায় সত্যানুসন্ধানের চেয়েও বড় ছিল ধর্ম। আমেরিকা তখনও ব্রিটেনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানিক ও যুক্তি-বুদ্ধির বন্ধনে বাঁধা। শেষ অবধি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনকারীরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও ইন্টেলেকচুয়াল বিদ্রোহে অবতীর্ণ হলেন। তাঁদের বক্তব্য হল ইংরেজরা জোর করে অনিচ্ছুক আফ্রিকান শ্রমিকদের চাপিয়ে দিয়েছে অনিচ্ছুক নতুন দুনিয়ার ঘাড়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে এই বক্তব্য ক্রমশই জোরদার হতে লাগলো। শেষকালে এমন দাঁড়ালো যে এক নিঃশ্বাসে ব্রিটেন ও ক্রীতদাসপ্রথা—দুটোকেই নিন্দে করতে লাগলেন ওদেশের ঐতিহাসিকেরা, যেন পবিত্র আমেরিকান চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছে ব্রিটিশেরা এই দুষ্কর্মটি সমাধা করে।

পরে ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর আশ্বাস মিললো যে মুক্ত শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীদের মানবিক চেষ্টায় শিগ্‌গীরিই ক্রীতদাসপ্রথা নামে এই কলঙ্কটি মোচিত হবে। তবে এই আশাবাদের আয়ু ছিল বড়ই অল্প ; দেশাত্মবোধ ও ব্রিটিশবিরোধী জঙ্গী মনোভাবের ভিত্তিতে সমস্ত ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব ছিল না। ক্রমশ পরিস্ফুট হল যে মার্কিন দেশের দাসপ্রথা শুধুমাত্র অভিজাত-সমর্থিত এক অস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, বরং এ এক ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাতে মজুরি বিনা অন্যের শ্রম ব্যবহারকে সমর্থন করা হয়। ফলে দাসপ্রথার উৎস নতুন করে সন্ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়লো। তবে এ যাত্রায় ইতিহাস লেখার সামাজিক পরিবেশ সম্পূর্ণ পৃথক।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই দেখা গেল প্রভাবশালী জাতীয় নেতারা ঐতিহাসিকদের সুরে সুর মিলিয়ে দাসপ্রথাকে নীতিবিরুদ্ধ বলে নিন্দা করতে শুরু করেছেন। কিন্তু এখন তো আর নন্দ ঘোষ ইংরেজের ঘাড়ে সব দোষের ভার চাপানোর উপায় নেই ; যা হোক একটা কোনো চলনসই ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে হবে ওই সদ্যোস্বাধীন দেশের বিকাশমান জাতীয় সত্তার থেকেই। ফলে বক্তব্যটা দাঁড়ালো যেন দাসপ্রথা একটা ভাগ্য নির্দেশিত ব্যাপার, fait accompli ; অনিচ্ছুক শ্রম আদায়ের জন্য বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত এক প্রথা। আবার কেউ কেউ লিখলেন কৃষ্ণাঙ্গেরা উষ্ণ জলবায়ুতে কঠিন শ্রমের জন্য বিশেষ উপযুক্ত। এরা না থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের রোগবালাই-ভরা জলাভূমি ও নীচু জমিগুলো অকর্ষিত পড়ে থাকতো। সুতরাং প্রকৃতিই যেন জোর করে দক্ষিণের রাজ্যগুলোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে দাসপ্রথার বোঝা। 'ন্যাচারাল স্লেভারি' এই মতবাদ পরবর্তীকালে বেশ জোরদার হয়। একদল মানুষের দৃঢ় ধারণা গড়ে ওঠে যে নিগ্রোরা তাদের সবল শরীর ও দুর্বল মন নিয়ে ক্রীতদাস হবার জন্যেই জন্মেছে।

মার্কিন ইতিহাসের এটাই বোধহয় সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কৃষ্ণাঙ্গ ও ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাস ও কৃষ্ণাঙ্গ অভিন্ন—এই ধারণার সুদূরপ্রসারী ফল দেখা গেছে দাসপ্রথা উচ্ছেদ ও গৃহযুদ্ধের সময়ে, বর্তমান শতাব্দীর ষাটের দশকে কৃষ্ণাঙ্গদের সমানাধিকার প্রসঙ্গে, এমনকি এর জের এখনও মিটে যায়নি কৃষ্ণাঙ্গ চেতনা থেকে।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গদের উচ্চ শিক্ষার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত 'ইউনাইটেড কলেজ ফান্ড'-এর প্রেসিডেন্ট রবার্ট অলব্রাইট বললেন কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে-মেয়েরা উচ্চশিক্ষার জন্যে তেমন করে এগিয়ে আসছে না। তার মধ্যে ক্রমশ কমে যাচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের সংখ্যা, যাকে ওঁরা বলছেন 'দি ডিসঅ্যাপীয়ারিং ব্ল্যাক মেল'। গত বছরে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিজ্ঞানে মোট সাড়ে চার হাজার ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে, তার মধ্যে মাত্র উনপঞ্চাশটি পেয়েছে কৃষ্ণাঙ্গরা। রবার্ট অলব্রাইটের মতে স্কুল, সমাজ ও পরিবারের থেকে কলেজে পড়াশুনো করতে যাবার জন্যে কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা যে পরিমাণ উৎসাহ পায়, ছেলেরা তা পায় না। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারগুলি থেকে বাড়ির ছেলেকে পড়াশুনোর খরচ দেওয়া হয় না, অথচ মেয়েদের খরচা করে পড়ানো হয়। এছাড়া রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেদের সামনে নানানরকমের প্রলোভন—যা তাদের উচ্চতর শিক্ষার আগ্রহ ও ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। চাকরি-বাকরির জগতেও কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ শ্বেতাঙ্গ সহকর্মীদের এক সূক্ষ্ম যৌন ঈর্ষার সম্মুখীন হয়। একদম ছোটোবেলা থেকেই কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেদের মারমুখী ভাব কমানোর সক্রিয় চেষ্টা চলে। ফলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার মাঠে তার অফুরন্ত এনার্জির প্রকাশ ঘটে। সমাজ তো আগে থেকেই ঠিক করে দিয়েছে যে এর পড়াশুনো বিশেষ হবার নয়, তাই কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেটির মধ্যে তার চেষ্টাও থাকে না; 'ডোন্‌ট্ রীচ ফর দ্য স্টার, অ্যাণ্ড ইউ ডোন্‌ট্ হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট ফেইলিং টু গ্র্যাব ইট'। মার্কিনী কৃষ্ণাঙ্গদের সামনে এটা আজ এক বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে।

এই সমস্যার আরও একটি দিক আছে। পুরুষেরা যদি পড়াশুনো শিখে ভালো রোজগারপাতি না করে তবে শিক্ষিতা, চাকুরীরতা কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা বিয়ে করবে কাদের ? আর্থিক অবস্থা শুধু খারাপই নয়, অধিকাংশ কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারগুলোর রুটি যোগাচ্ছেন মেয়েরা। সাম্প্রতিক এক জনগণনায় ধরা পড়েছে যে ক্রমশ অধিকতর অনুপাতে কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের ভরণপোষণ করছে মেয়েরা। দারিদ্র্যের মাত্রা যত বাড়ে, কৃষ্ণাঙ্গ নারী-প্রধান সংসারের সংখ্যাও বাড়ে। বর্তমানে সমস্ত দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারগুলোর ৬৫ শতাংশেরই কর্তা বা কর্ত্রী হলেন কোনো না কোনো নারী। দাসপ্রথার সময় থেকে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা চাইতেন না কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা-সংসারের বন্ধন গড়ে উঠুক। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কৃষ্ণাঙ্গ নারী-পুরুষ দাসেরা সন্তানের জন্ম দিলে জোর করে পৃথক করে দেওয়া হত এই দম্পতিদের। সরিয়ে দেওয়া হত সন্তানের পিতাকে, অন্য কোনো তুলোর আবাদে। অনেক বছর ধরে এই নিয়ম চলে এসেছে বলে কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের তেমন কোনো ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি ওদেশে।

এর ফল হয়েছে দুটো। সংসারের দায়িত্ব একা সামলাতে গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি প্র্যাকটিকাল, সন্তান-সন্ততি যেন তাদেরই একার সম্পত্তি। অন্যদিকে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষেরা তুলনামূলকভাবে নিশ্চয়ই কিছুটা দায়িত্বজ্ঞানহীন। ভেতর-শহরের দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেরা গোঁফ না উঠতেই গর্ব করতে শেখে 'আই অ্যাম দ্য ফাদার অব টু বিগ চিলড্রেন' যেন 'পুরুষালী' হবার এটাই সবচেয়ে বড় লক্ষণ। মার্কিন দেশে তো বটেই, গোটা পাশ্চাত্যেই আজ পরিবারের ভাঙন ঘটছে। কিন্তু মার্কিনী কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের এই দৈন্যদশা, এই অবক্ষয় তার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সবচেয়ে সমবেদনা দাবি করে। এককালে শ্বেতাঙ্গ সমাজ কৃষ্ণাঙ্গ দাসদাসীদের স্বাভাবিকভাবে ভালবাসার অধিকাররটুকুও দেয়নি, সেই কৃতকর্মের ফল আজও ভুগতে হচ্ছে গোটা দেশকে।

কৃষ্ণাঙ্গ সংস্কৃতি ও চেতনা

দাস-বোঝাই জাহাজগুলোর বর্বরতা ও নৃশংসতা, নীলাম-বাজারের অমানবিকতা এবং দাসব্যবসায়ীদের নির্দয়তা যে কোনো মানুষের মনের জোর ভেঙে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কৃষ্ণাঙ্গ দাসকে মনে করা হত পঙ্গুর চেয়েও অধম, যার কোনো অধিকার নেই, কাজ করাই যার একমাত্র কাজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার আফ্রিকান সংস্কৃতিকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হতে লাগলো। পাছে ঢোল ও শিঙার মাধ্যমে সাংকেতিক ভাষায় যোগাযোগ করে, তাই মিসিসিপিতে আইন করে কৃষ্ণাঙ্গদের এই দুটি যন্ত্র বাজানো নিষিদ্ধ হল। বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই-এ আমেরিকার নিগ্রো হারালো তার উপজাতি-সত্তা। আফ্রিকান সংস্কৃতি-ধ্বংসে বিরাট বড় ভূমিকা নিয়েছিল ওদেশের চার্চ। দাসপ্রথার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চার্চের বিশেষ অস্বস্তি হয়নি। এ জন্মের কষ্ট-লাঞ্ছনার পুরস্কার পাওয়া যাবে পরজন্মে—এরকম একটা ধারণা কৃষ্ণাঙ্গদের বোঝানোর সক্রিয় চেষ্টা হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মই শ্বেতাঙ্গদের ক্ষমতার চাবিকাঠি—এই বিশ্বাসে কৃষ্ণাঙ্গ দাসেরাও আগ্রহভরে নতুন ধর্মকে বরণ করে নিল। একের পর এক ঢেউয়ে বংশপরম্পরায় দাসেরা ধর্মান্তরিত হতে লাগলো, আর কৃষ্ণাঙ্গ জীবনযাত্রায় সুদীর্ঘকালের জন্য পড়ল ধর্মের এক গভীর ছাপ। কৃষ্ণাঙ্গ সোল বা ব্লুজ সংগীতে, গোড়ার দিকের জ্যাজে ধার্মিকতার প্রভাব বেশ স্পষ্ট। তবে মানুষকে বাঁধতে চাওয়ার 'অধিকার' যদি মানুষের থাকে, শেকলে বাঁধা মানুষেরও পালাতে চাওয়ার অধিকার রয়েছে। গৃহযুদ্ধের আগে থেকেই কৃষ্ণাঙ্গরা মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করেছে; কতজন পালিয়েছে, বিদ্রোহ করেছে—তার কোনো হিসেব নেই। প্রাণের টান, শিকড়ের টান কি সহজে ভোলার? তাই দাসপ্রথারও আগেকার এক আফ্রিকান হেরিটেজ সূক্ষ্মভাবে থেকেই গেল কৃষ্ণাঙ্গ সংগীত ও নৃত্যে।

আজকের মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বেশ চোখে পড়ে এই ফেলে আসা, হারিয়ে যাওয়া ধর্ম ও সংস্কৃতির হেরিটেজকে খুঁজে বার করার আকুলতা। সংস্কৃতির যা কিছু শ্বেতাঙ্গদের, তাকেই বর্জন করে চলার চেষ্টা করে চলেছে আত্তিয়া। পুরো নাম ডেবরা আত্তিয়া মেলটন, বয়েস পঁয়ত্রিশ, পেশায় ভাস্কর। খ্রীষ্টধর্ম ছেড়ে ইসলাম বরণ করে নিয়েছে ও। বারে বারে ঘুরে ফিরে যায় আফ্রিকায়, খুঁজে বার করার চেষ্টা করে নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। আত্তিয়াই সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল আমায় বিখ্যাত জ্যাজ শিল্পী লুই আর্মস্ট্রং-এর জীবন নিয়ে লেখা অপেরা 'স্যাচমো' দেখাতে, ওয়াশিংটন ডি· সি-র নামকরা হল কেনেডি সেন্টারে। ও-ই আমায় মার্কিনী কৃষ্ণাঙ্গের হৃদয়ে টিকে থাকা ক্রান্তীয় উষ্ণতার ছোঁয়া প্রথম চেনায়; প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর মানুষগুলোর মনের নানা টানাপোড়েন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, অবিশ্বাস ও উদ্যমের কাছাকাছি নিয়ে আসে। চার্চ থেকে শুরু করে ঘরোয়া আড্ডার আসর; ফোরটীন্থ্ স্ট্রিটের 'লোত্রেক' বার থেকে শুরু করে 'কিলিমানজারো' নাইট ক্লাব; কিংবা বানেকার গ্রাউণ্ডের 'রেগে' উৎসব থেকে শুরু করে 'ট্যাকোমা স্টেশন-এর' কৃষ্ণাঙ্গ নাচের আসর চিনিয়েছে এই আত্তিয়াই। নিউ ইয়র্কের কৃষ্ণাঙ্গ ঘেটো হারালেমের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে চিনিয়েছে সেই বিখ্যাত গন্ধ—ফ্রায়েড চিকেন, বীয়ার ও দারিদ্র্যের। আত্তিয়ার সঙ্গে গিয়েছিলাম এক 'নিউ ওয়েভ' কৃষ্ণাঙ্গ বিয়েতে। নিতাঞ্জু-তায়ারে দুজনেই পুরনো নাম ফেলে দিয়ে আফ্রিকান নাম নিয়েছে, তৈরি করেছে গানের দল 'সুইট হানি অন দ্য রক্স্'। দলের ছেলেমেয়েরা গান গাইলো, খোলা আকাশের নীচে বাগানে ওরা দুজনে আফ্রিকান পোশাকে সজ্জিত হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলো, চার্চের প্রতিনিধির জায়গায় পুরোহিত হলেন স্থানীয় এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, আর ঘণ্টার বদলে বেজে উঠলো আফ্রিকান ঢাক যার আদিম তালে তালে পা ফেলে শুরু হল উদ্দাম নাচ।

শুধু আত্তিয়া বা তার শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবই নয়, আজকের মার্কিন দেশের কৃষ্ণাঙ্গদের এক বিরাট অংশ ওদেশের মূল সংস্কৃতির ধারাকে অগ্রাহ্য করে যেন এক উপসংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। শিক্ষার প্রসার ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি তাদেরকে নিজেদের গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। শহরের রাস্তায় কালো ছেলে-মেয়ের দল টী-শার্ট পরে ঘুরতো, দেখেছি বুকে বড় বড় করে লেখা 'ব্ল্যাক পাওয়ার'। হাওয়ার্ডের কৃষ্ণ-অস্তিত্ব যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্যে বুকে ঘোষণা 'ব্ল্যাক বাই পপুলার ডিমাণ্ড'। কৃষ্ণাঙ্গদের ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দেবার জন্যে নিয়মিত ছাপা হয় 'ব্ল্যাক এণ্টারপ্রাইজ' পত্রিকা, যাতে কৃষ্ণাঙ্গ উদ্যোক্তাদের সাফল্যের কাহিনী জুড়ে থাকে অনেকগুলো পাতা। এরকম পত্র-পত্রিকা রয়েছে আরও অসংখ্য; 'সাদার্ন ওয়ার্কম্যান', 'ক্রাইসিস', 'নিগ্রো ডাইজেস্ট', 'পিট্স্বার্গ কুরিয়ার', 'এবনি'—এগুলো চলে সারা দেশ জুড়ে। কৃষ্ণাঙ্গ ত্বকের আলাদা প্রসাধন দ্রব্য, শক্ত কোঁকড়া চুল সামলানোর ক্রীম, বা কড়া দাড়ি কামানোর মলম—এসব আর নতুন নয়। আলাদা পোশাক, আলাদা প্রসাধন, আলাদা শিল্প, আলাদা বিনোদন, আলাদা ঢঙে বলা ইংরেজি বা 'নিগ্রো ডায়লেকট' যা আজকে শিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গেরাও আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে—এসবই কৃষ্ণাঙ্গ উপসংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গ। এককালে ছিল জোর জবরদস্তি করে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের ভেদাভেদ; এখন যেন কৃষ্ণাঙ্গেরা স্বেচ্ছায় নিজেরাই এই তফাত সৃষ্টি করছে শ্বেতাঙ্গ-আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয় প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে।

কৃষ্ণাঙ্গ আত্মজিজ্ঞাসা

শিকড়-ছেঁড়া, ঐতিহ্য-হারানো, অবিরাম জাতি-সংমিশ্রণের ফসল এই মানুষগুলোর মনে যে এক বিপুল আত্মজিজ্ঞাসা থাকবে, তাই তো স্বাভাবিক। দাসপ্রথা উচ্ছেদ হয়েছে আজ অনেকদিন; আইনের চোখে সমান অধিকার মিলেছে তাও কম দিন নয়। কিন্তু মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ এখনও প্রশ্ন করে চলেছে: 'আমি কে?' এই প্রশ্নের উত্তর সহজে মেলার নয়। কৃষ্ণাঙ্গদের মনে এখনও বিপুল দ্বন্দ্ব—শ্বেতাঙ্গদের অনুকরণ, মিলে-মিশে যাওয়া, অথবা নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে তুলে ধরা—এই দুই পথের কোনটিকে বেছে নেবেন তাঁরা? দুটো মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর পরিহাসে। একদিকে আচার ব্যবহার, কেতা-কানুনে কৃষ্ণাঙ্গরা শুষে নিতে চেয়েছে শ্বেতাঙ্গ সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে। এই খোঁড়ানো অনুকরণ শ্বেতাঙ্গরা উপহাস করেছে, নাম দিয়েছে: 'জিম ক্রো'। আবার অন্যদিকে ব্লুজ থেকে জ্যাজ, কেক ওয়াক থেকে আজকের ব্রেক ডান্স—শ্বেতাঙ্গরাও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ সংস্কৃতির অনুকরণ করার। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, এই দুই গোষ্ঠীর টানাপোড়েনের পাশাপাশি আরও রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গদের একান্ত নিজস্ব মানসিক যন্ত্রণা।

সচ্ছল কৃষ্ণাঙ্গ গৃহ *ছবি: লেখিকা*

একদিকে তাই ভুলে-যাওয়া লোক-ঐতিহ্যকে জড়িয়ে ধরার প্রবণতা, অন্যদিকে পুরোনো সব কিছুর মায়া ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা।

কৃষ্ণাঙ্গ কবি আর্না বনটেম্পস্ তাঁর ছোটোবেলার গল্পের এক জায়গায় লিখছেন—মা মারা যাবার পরে শ্বেতাঙ্গ বোর্ডিং স্কুলে পড়াশুনো করতে যাবার সময়ে বাবা সাবধান করে দিলেন: 'নাউ ডোন্ট্ গো আপ দেয়ার অ্যাকটিং কালারড'। অর্থাৎ এবার থেকে তাঁকে মনে করতে হবে যে সত্যি সত্যি দুই বর্ণের মানুষদের মধ্যে কোন তারতম্য নেই, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মিলেমিশে রয়েছে, কৃষ্ণাঙ্গ বলে তিনি পৃথক নন অন্যদের থেকে। লেখকের ক্রুদ্ধ বিস্ফোরণ: 'হাউ ডেয়ার এনিওয়ান—পেরেন্ট, স্কুল-টীচার, অর মীয়ারলি লিটারারি ক্রিটিক—টেল মি নট টু অ্যাকট কালারড?'

তাহলে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ কে? ওদেশ ছেড়ে চলে আসার আগে সেই প্রশ্নই করেছিলাম জেফকে। কৃষ্ণাঙ্গ সত্তা আর মার্কিন সত্তা—কোনটা আসল, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমার কাছে? এক মুহূর্তের দ্বিধা, তার পরেই উত্তর দেয় সে: 'আই অ্যাম ফার্স্ট অ্যান অ্যামেরিকান, দেন আ ব্ল্যাক'। এই একটি উত্তরের মধ্যে পাওয়া যাবে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গের মানসিকতার নির্যাসটুকু।